❖ জেলার সৃষ্টির ইতিহাস

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই দেওয়ানীকে প্রথম রাজস্ব প্রশাসন হিসেবে অভিহিত করা যায়। সে সময় মুন্সিগঞ্জ ঢাকা জেলার অংশ ছিলো। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিঃ মিডেলটন স্বাধীনভাবে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি সর্বোচ্চ জমিদারি ডাককারীদের অনুকুলে মহালগুলো লিজ দিয়ে ছিলেন। এদিকে লিজ প্রাপ্ত জমিদারগণ আবার সাব লিজ দিতে থাকলেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজস্ব প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাদেশিক কাউন্সিল কাজ করে।

ঢাকা কালেক্টটের আওতায় ১৯৪৭ সালে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা সৃস্টি হয়,জনাব কে এস এইচ চৌধুরি ই পি সি এস মুন্সিগঞ্জের প্রথম এস ডি ও ছিলেন। জনাব চৌধুরী ২২-০৮-১৯৪৭ থেকে ১৭-০৭-১৯৪৯ পর্যন্ত এস ডি ও পদে দায়িত্ত পালন করেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুনশিগঞ্জ জেলা ঘোষণা করা হয়।এর আগে জেলার প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো ঢাকা থেকে । মুন্সীগঞ্জের প্রথম জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম তিনি এ জেলায় ০১-০৩-১৯৮৪ থেকে ১৯-০৬-১৯৮৪ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ত পালন করেন।

জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরও। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছেন তিনজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপ পরিচালক স্থানীয় সরকার, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, নেজারত ডেপুটি কালেক্টরসহ বেশ ক'জন সহকারী কমিশনার ও বিভিন্ন কর্মকর্তা। তিনি সাধারণ প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জেলা রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যাস্ত ।

জেলা প্রশাসনের অধঃস্তন প্রশাসন হচ্ছে উপজেলা প্রশাসন। এই প্রশাসনের প্রধান হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি)সহ অন্য কর্মকর্তাগণ।সময়ের বিবর্তনে মানুষের প্রয়োজনে ভিন্ন মাত্রা যোগ হলেও কেন্দ্রিয় সরকারের প্রতিভু হিসেবে জনগনকে সেবাপ্রদানের কাজটিই জেলা প্রশাসনের প্রধান কাজ হিসেবে রয়ে গেছে।

❖ নামকরণ

আজকের মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রাচীন বাংলার গৌরবময় স্থান বিক্রমপুরের অংশ। মুন্সীগঞ্জ সে সময়ে একটি গ্রাম ছিল ইদ্রাকপুর। কথিত আছে, মোঘল শাসন আমলে এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুন্সী হায়দার হোসেন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোঘল শাসকদের দ্বারা ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষী মুন্সী হায়দার হোসেনের নাম অনুসারে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সীগঞ্জ। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুন্সীগঞ্জ থানা ও মহকুমা হিসেবে উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালে ১ মার্চ মুন্সীগঞ্জ জেলায় রুপান্তরিত হয়।

❖ ভৌগোলিক অবস্থান

➢ অবস্থানঃ

মুন্সীগঞ্জ জেলাটি ২৩:২৯ থেকে ২৩:৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০:১০ থেকে ৯০:৪৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবিস্থিত।

➢ আয়তনঃ ৯৫৪.৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ

➢ সীমানাঃ

পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাদঁপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত। পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা নদী বিভাজিত করেছে। উত্তরে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। দক্ষিণে পদ্মা নদী যার অপর পার্শ্বে শরিয়তপুর জেলা।

উপজেলার আয়তন

গজারিয়া উপজেলার আয়তন	১৩০.৯২ বর্গ কিলোমিটার
লৌহজং উপজেলার আয়তন	১৩০.১২ বর্গ কিলোমিটার
মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার আয়তন	১৬০.৭৯ বর্গ কিলোমিটার
সিরাজদিখান উপজেলার আয়তন	১৮০.১৯ বর্গ কিলোমিটার
শ্রীনগর উপজেলার আয়তন	২০২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার
টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আয়তন	১৪৯.৯৬ বর্গ কিলোমিটার

➢ সীমান্তবর্তী জেলা সমূহ

পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও হোমনা উপজেলা, চাদঁপুর জেলার মতলব উপজেলা যা মুন্সীগঞ্জের সাথে প্রবাহিত মেঘনা নদীর দ্বারা বিভাজিত। পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে পদ্মা নদী বিভাজিত করেছে। উত্তরে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও দোহার উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। দক্ষিণে পদ্মা নদী যার অপর পার্শ্বে শরিয়তপুর জেলা।

➢ ভূপ্রকৃতি

মুন্সীগঞ্জ সমতল এলাকা নয়। জেলার কিছু কিছু অঞ্চল যথেষ্ট উঁচু যদিও জেলায় কোনো পাহাড় নেই। মুন্সীগঞ্জের বেশির ভাগ এলাকা নিম্নভূমি বলে বর্ষায় পানিতে অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে।

➢ প্রধান নদ-নদী

মুন্সীগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদী: পদ্মা, মেঘনা, ছোট ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, ইছামতি, ইত্যাদি।

- জলবায়ু

মুন্সীগঞ্জের জলবায়ু সমভাবাপন্ন আর্দ্রতাযুক্ত। এখানকার জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তশীল। মুন্সীগঞ্জ বর্ষাপ্রধান স্থান। গ্রীস্মকালে এলাকার অনেক স্থান পানি শূন্য হয়ে পড়ে। ঝড়বৃষ্টির প্রকোপও এই এলাকায় যথেষ্ট। শীতকালে শীতের তীব্রতা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো তত প্রবল নয়। এলাকাটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলভূক্ত।

- জীববৈচিত্র

❖ প্রশাসনিক তথ্য

- জনসংখ্যাঃ ১৪,৪৫,৬৬০ জন(সূত্রঃ বিবিএস)

- শিক্ষার হারঃ ৫৬.১% (সূত্রঃ বিবিএস)
- সংসদীয় আসন সংখ্যাঃ ০৩ (তিন) টি

নির্বাচনী এলাকার/সংসদীয় আসনের নাম	সাংসদের নাম	ফোন ও ই-মেইল	মন্তব্য (কোন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কি না/ সংসদীয় কোন স্থায়ী কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কি না
সংরক্ষিত আসন-২২	বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা	০১৭১১০৫৩১৮৮	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুন্সীগঞ্জ-০১	জনাব মাহি বি চৌধুরী	০১৮৩৮৮৮৮৮৪	
মুন্সীগঞ্জ-০২	বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি	০১৭১১৬৯৭৩৫৩	
মুন্সীগঞ্জ-০৩	এডভোকেট মৃনাল কান্তি দাস	০১৬৭১৫৭৫৪৪৬	

- উপজেলাঃ ০৬ টি

উপজেলার নাম	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নাম	ফোন ও ই-মেইল
মুন্সীগঞ্জ সদর	জনাব মোঃ আনিছুজ্জামান	০১৭১৫৫২১৮০৪

শ্রীনগর	জনাব মোঃ মসিউর রহমান (মামুন)	০১৭১১১৬৫৪০৮
সিরাজদিখান	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ	০১৭১২৯২২৯৪০
লৌহজং	জনাব মোঃ ওসমান গণি তালুকদার	০১৭১১৫২৪২৮৬
টঙ্গীবাড়ী	জনাব মোঃ জগলুল হালদার ভুতু	০১৭১১৯৬০১৭৬
গজারিয়া	জনাব আমিরুল ইসলাম	০১৭১১৫৩৩০৮৬

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ ০৬ টি
- পৌরসভাঃ ০২ টি
- ইউনিয়ন পরিষদঃ ৬৮ টি
- আবাসন/আশ্রয়ন প্রকল্পঃ ২১ টি
- আদর্শ গ্রামঃ ০৮ টি
- স্কুলের সংখ্যা

  - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ সরকারী ৫০৪টি, বেসরকারী রেজিঃকৃত ৩৪টি =মোট ৬১০ টি
  - মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ সরকারী ৩টি, বেসরকারী ৮৫টি, বেসরকারী জুনিয়র ১১টি =মোট ৯৯টি

- কলেজের সংখ্যাঃ সরকারী ৪টি, বেসরকারী ৯টি =মোট ১৩টি
- জেনারেল হাসপাতালের সংখ্যাঃ ০১ টি

❖ ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ

আড়িয়াল বিল

বর্ষাকালে অথৈ জলরাশি আর শীতকালে বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেতে পূর্ণ দেশের মধ্যাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন বিলের নাম আড়িয়াল বিল । ঢাকার দোহার, নবাবগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলার প্রায় ১৩৬ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বিলের অধিকাংশ অংশ মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। ধারণা করা হয়, প্রাচীনকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থল নদীর প্রবাহের ফলে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণে মুন্সীগঞ্জ জেলার পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মাঝে আড়িয়াল বিলের উৎপত্তি।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে সাজানো আড়িয়াল বিলে ঋতুভেদে নতুন নতুন বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটে। বর্ষাকালে সবুজে ঘেরা বিলের স্বচ্ছ পানিতে শাপলা, কচুরি পানার ফুল এবং নানা জাতের পাখির উপস্থিতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য মাত্রা যুক্ত করে। আর শীতকালে বিলের স্থলভাগে নানা ধরনের শীতকালীন সবজির চাষ করা হয়। শাপলা তোলা, নৌকায় চড়ে মাছ ধরা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভ্রমণকারী সময় কাটাতে ছুটে আসেন আপন রুপে অনন্য আড়িয়াল বিলে।

কিভাবে যাবেন?

ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর উপজেলার আড়িয়াল বিলের দূরত্ব প্রায় ৪২ কিলোমিটার। ঢাকার গুলিস্থান, আবদুল্লাপুর বা মিরপুর থেকে মাওয়াগামী যেকোন বাসে চড়ে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে যাওয়া যায়। শ্রীনগরের বাজার থেকে রিকশা নিয়ে গাদিঘাট যেতে হবে। ঘাট থেকে হাতে টানা বা ইঞ্জিনচালিত নৌকায় শ্রীনগর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আড়িয়াল বিলে যেতে পারবেন। চাইলে কয়েকজন মিলে ১০০০-১৫০০ টাকার মধ্যে নৌকা ভাড়া করে সারাদিন আড়িয়াল বিল ঘুরতে পারবেন।

মুন্সীগঞ্জের নৌকা বাইচ

দেশজ সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য নৌকা বাইচ। বিশাল উৎসব মুখর পরিবেশে মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীতে ঐতিহ্যবাহী এ নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে লাখো মানুষের ঢল নামে। বন্দর নগরী মিরকাদিম থেকে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাট পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার এলাকায় নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক আসে। প্রতিবছর অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগীতায় ৬০ মাল্লা, ৫০ মাল্লা এবং ২৫ মাল্লার নৌকা অংশগ্রহণ করে থাকে।

মুন্সীগঞ্জে হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান মিলেছে। প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধারে চালানো খনন কাজের মাধ্যমে এ বৌদ্ধ

বিহার আবিষ্কৃত হয়। একেকটি ভিক্ষু কক্ষের পরিমাপ আনুমানিক ৩ দশমিক ৫ মিটার (দৈর্ঘ্য) ও ৩ দশমিক ৫ মিটার (প্রস্থ)। ধারণা করা হচ্ছে, বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান তাপস অতীশ দ্বীপঙ্করের সঙ্গে এ বৌদ্ধ বিহারের সম্পর্ক রয়েছে। আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারের নকশা অনুযায়ী এর একটি প্রাচীর দেয়াল উত্তর দিকেও অপর আরেকটি দেয়াল পশ্চিম দিকে ধাবমান বলে নিশ্চিত হয়েছেন খননকারীরা। যেসব ভিক্ষু কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে তা বৌদ্ধ বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মের পণ্ডিত ও বিশ্বের দ্বিতীয় বুদ্ধ অতীশ দ্বীপঙ্করের বাস্তুভিটার কাছে সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী ও রামপাল অঞ্চলে প্রাচীন নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ উদ্ধারে ২০১১ সাল থেকে প্রত্নতত্ত্ব জরিপ ও খনন কাজ হাতে নেয়া হয়। অগ্রসর বিক্রমপুর নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা প্রকল্প এখন কাজ করে আসছে। প্রত্নতত্ত্ব খনন কাজের গবেষণা পরিচালক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একদল প্রত্ন-খননকারী এ খনন কাজ করে আসছেন।
বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কারের ফলে বিক্রমপুর অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে আরো একধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করা হয়েছে। কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বে জায়গা করে নেবে আবিষ্কৃত এ বৌদ্ধ বিহার এমনটাই জানিয়েছেন অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

ভাগ্যকুলের মিষ্টি

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুল বাজার সুস্বাদু মিষ্টি ও ঘোলের জন্য সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে সুপরিচিত। আদি ও আসল স্বাদের সন্দেশ, ছানা, চমচমের মত বিভিন্ন মিষ্টান্ন খেতে চাইলে ভাগ্যকুল এক স্বর্গীয় স্থান। রকমারি মিষ্টির বাহার নিয়ে ভাগ্যকুলের বিভিন্ন মিষ্টান্ন ভান্ডারগুলো যেন আপ্যায়নের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে গোবিন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভান্ডার অতুলনীয় স্বাদের মিষ্টি ও ঘোলের জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। যদিও ভাগ্যকুলের সকল দোকানেরই রয়েছে সমান সুনাম।

কিভাবে যাবেন?

ঢাকার গুলিস্থান হতে দোহারগামী বাসে চড়ে বালাশুর নেমে রিকশা বা সিএনজি নিয়ে সরাসরি পদ্মা নদীর তীরে ভাগ্যকুল বাজার যেতে পারবেন।

মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের কলা

একদা মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর তথা রামপালের কলার প্রচুর খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে।দেশের চাহিদা মিটিয়ে রামপালের ওই কলা যেতো মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায়। সেই কলা এতই সুস্বাদু ছিল যে, একবার খেলে মুখে লেগে লাগতো অনেকটা সময় ধরে। রামপাল সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচিত হয়ে উঠে এ কলার কারনেই। মুন্সীগঞ্জ

শহরের পূর্বাংশের এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে দেওভোগ, শিলমন্দি, বৈখর। বল্লাল রাজার, রামপালের প্রতিটি বাড়িই ছিল এক একটি কলার বাগান। এক চিলতে ফাঁকা জায়গা পেলেই কলা চাষীরা সেটাকে কাজে লাগাতো ওই কলাচাষ করে। খাওয়ার মধ্যে বেশ মজাদার ছিল রামপালের কলা। এর ভেতরে এক সুঘ্রান পাওয়া যেতো যা মানুষের আহারের তৃপ্তি মেটাতো।

ষোলআনী সৈকত

ঢাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানায় মেঘনা নদীর পাড় ঘেঁষা ষোলআনী প্রজেক্ট বর্তমানে ষোলআনী সৈকত নামে পরিচিত। এই স্থানটি আগে দৌলতপুর নামে পরিচিত ছিল। নদী ভাঙ্গন রোধ করতে মেঘনা নদীর পাড়ে সিসি ব্লক দিয়ে বাধ নির্মাণের ফলে এই স্থানটির সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রকৃতিপ্রেমীদের আকর্ষণ করে। ঢাকা থেকে দূরত্ব কম হওয়ার কারণে বাইকারদের কাছে এই স্থান অতি অল্প সময়ে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ষোলআনী সৈকতের মনোরম পরিবেশে মেঘনা নদীর বুকে নৌযানের বিচরণ, অসীম নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো, অপূর্ব সূর্যাস্তের সৌন্দর্য কিংবা ভরা জোছনার মোহনীয় রূপ উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া এখানে নৌকা ভাড়া করে মেঘনার বুকে ভেসে বেড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

মাওয়া ফেরি ঘাট

মাওয়া ফেরি ঘাট পর্যটকদের জন্যে নদী ভ্রমণ এবং ইলিশ ভোজন এর জন্যে জনপ্রিয় একটি জায়গা। মাওয়া ফেরি ঘাটের পাড়ে রয়েছে বেশকিছু খাবার হোটেল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইলিশ খাওয়ার জন্য অনেকেই মাওয়া ঘাটে ছুটে আসেন। এখানকার মাছের বাজারে ইলিশ ছাড়াও অনেক বাহারি প্রজাতির তাজা মাছ পাওয়া যায়।

ঢাকার কাছে অবস্থান হওয়ায় চট করে পদ্মা পাড়ের এই মাওয়া ফেরি ঘাট হতে দিনে গিয়ে দিনেই ঘুরে আসা যায়। তাই একদিনের ভ্রমণ করার জায়গা হিসেবে অনেকের কাছে মাওয়া ঘাট অনেক জনপ্রিয় একটি স্থান। রুপালী জলের ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে পাড় ধরে দূরে হেটে যাওয়া কিংবা পদ্মা পাড়ের শান্ত সবুজ গ্রামের যান্ত্রিকতা ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশ আপনাকে আছন্ন করে রাখবে। নৌকায় ঘুরে দেখতে পারবেন পদ্মার বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য। তাছাড়া ধোঁয়া উঠা গরম ভাতের সাথে পদ্মার ইলিশের স্বাদ কি আর অন্য কিছুতে মেটানো সম্ভব! আরও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পেতে পদ্মার বুকে ১৫০ টাকা ভাড়ায় স্পীড বোটে এপার থেকে ওপারে যেতে পারেন।

ইলিশের টানে মাওয়া ফেরি ঘাটের পানে

ঢাকা থেকে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দূরত্বে পদ্মা, ইলিশ আর মিষ্টির জন্য বিখ্যাত মাওয়া। ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইলিশ খেতে যেত ঢাকাবাসীর প্রথম পছন্দ মাওয়া ফেরি ঘাট। প্রাচীন কাল থেকেই ইলিশের চাহিদা সর্বত্র বর্তমানে এর চাহিদা দেশ চাড়িয়ে বিদেশেও পৌছে গেছে, আর সেই ইলিশ যদি হয় মাওয়া ঘাটের পদ্মার রুপালী ইলিশ তাহলে তো জ্বিবে পানি আসার ই তো কথা ।আর সে জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে ইলিশ খেতে আসেন ভোজন রসিকরা। এই বিশাল চাহিদা পূরণে মাওয়া ঘাটের পাড়ে গড়ে ওঠেছে ছোট-বড় হোটেল। রয়েছে মৌসুমি ফলসহ অন্যান্য পণ্যের বিশাল সমারোহের দোকান। এছাড়াও রয়েছে খন্ড-খন্ড মাছের বাজার। এ মাছের বাজার গুলোতে বিক্রি হচ্ছে পদ্মা নদীর তাজা ইলিশ সহ ছোট-বড় মাছ। দর্শনার্থী কিংবা ভোজন রশিক যাই বলেন তাদের কাছে নদীর তাজা মাছের চাহিদা ব্যাপক,আর এখানোও তার ব্যতিক্রম নয়।

নাটেশ্বরের হারানো নগরী: মুন্সীগঞ্জের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে নাটেশ্বর প্রত্নতাত্তিক খননকৃত বৌদ্ধ মন্দির ও স্তুপ অন্যতম। টংগিবাড়ী উপজেলার সোনারং টংগিবাড়ী ইউনিয়নের নাটেশ্বর গ্রামে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের প্রত্নতাত্তিক খননে আবিস্কৃত হয় মন্দির এবং স্তুপ স্থাপত্যের অংশবিশেষ।

সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে- অসাধারণ বৌদ্ধ মন্দির, তিনটি অষ্টোকোণাকৃতির স্তুপ, পিরামিড আকৃতির বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্তুপ, কেন্দ্রীয় মন্দির, হাজার বছর আগের রাস্তা, নালা প্রভৃতি।

ঐতিহ্যবাহী কাঠ ও টিনের বাড়ি-ঘর:

কাঠের বাড়ির জন্য জনপ্রিয় জেলা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ কাঠের দোচালা,চৌচালা বাড়ির জন্য অনেক বিখ্যাত।এখানে আসলেই চোখে পরবে বিভিন্ন উপজেলায় সারি সারি কাঠের দোচালা, চৌচালা। মুন্সিগঞ্জ জেলার একটা অংশ প্রতিবছরেই সর্বনাশা পদ্মা নদীর কবলে পরেন।সে নদী ভাঙনে হারিয়ে যায় মানুষের বসত বাড়ি।মূলত সেখান থেকে উঠে এসেছে কাঠের বাড়ি তৈরির প্রচলন। এই বাড়ি গুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে খুব সহজেই জোড়ায় জোড়ায় খুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা যায়।ফলে নদী ভাঙ্গনের সময় সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায় বাড়িগুলো।মাটি, খড়,বাঁশ, বিভিন্ন জাতের কাঠ, প্লেনশিট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কারুকাজ মিশ্রিত এই বাড়িগুলো যেনো রুচিশীল তারই প্রকাশ ঘটায়।

মাওয়া রিসোর্ট

ঢাকার খুব কাছেই বেড়ানোর জায়গা কিংবা আবকাশ কেন্দ্র যারা খুঁজছেন তাদের জন্য পদ্মার পাড়ের মাওয়া রিসোর্ট হতে পারে প্রথম পছন্দ। রিসোর্ট দেখলেই মনে হবে যেন নিজের ছিমছাম ঘর, অথচ একটু সামনেই প্রমত্তা নদী পদ্মা। ঢাকা থেকে ৩৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বিক্রমপুরের লৌহজং উপজেলার মাওয়া ১ নম্বর ফেরিঘাট থেকে একটু দক্ষিণে মাওয়া-ভাগ্যকুল রাস্তার কান্দিপাড়া গ্রামে নির্মিত এ রিসোর্টি জেনো প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত একটি অন্য রকম পর্যটন কেন্দ্র।

- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ ছাত্রজনতা সরকারি অস্ত্রাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র লুট করে এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৯ মে পাকবাহিনী গজারিয়া অভিযান চালিয়ে চার শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসিকে গুলি করে হত্যা করে এবং ১৪ মে কেওয়ারে হামলা করে কিছুসংখ্যক যুবককে হত্যা করে। এর আগে ৩১ মার্চ পাকবাহিনী নারায়ণগঞ্জে আক্রমণ চালালে মুন্সিগঞ্জের তরুণরা নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ প্রতিহত করে। জুলাই মাসে ধলাগাঁও এলাকায় শত শত যুবককে রিক্রুট করে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তারা বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেয়। ১১ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা শ্রীনগর থানা, ১৪ আগস্ট লৌহজং থানা নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে টংগিবাড়ী থানা আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে। মুক্তিযোদ্ধারা উপজেলার শিবরামপুরে আক্রমণ চালিয়ে পাকবাহিনীর তিনটি গানবোট ডুবিয়ে দেয় এবং এতে বেশসংখ্যক পাকসেনা নিহত হয়। গোয়ালিমান্দ্রায় মুক্তিযোদ্ধারা ৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এক সম্মুখ লড়াইয়ে প্রায় ৩৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকবাহিনী শেখর নগর গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং নিরীহ লোকদের হত্যা করে। ২৭ রমজান শবে কদর রাতে ১১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাদের ওপর সম্মিলিত আক্রমণ চালিয়ে মুন্সিগঞ্জ শহর দখল করে নেয়। ৪ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা টংগিবাড়ী থানা দখল করে নেয় এবং ১১ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়।

- দর্শনীয় স্থান

ইদ্রাকপুর কেল্লা, বাবা আদম শাহ-র মসজিদ, পন্ডিত অতীশ দীপঙ্করের ভিটা, হাঁসাড়া দরগা, রামপালের দিঘি, রাজা বল্লাল সেনের ভিটা, হরিশচন্দের দিঘী, রাজা শ্রীনাথের বাড়ি, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ি, কোদাল ধোয়ার দিঘি, মাওয়া ফেরীঘাট, ইত্যাদি।

- বিশেষ উৎসবঃ নাই
- ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীঃ নাই

❖ মানচিত্র সংক্রান্ত নির্দেশনাঃ

- বাংলাদেশের মানচিত্রে নিজ জেলা

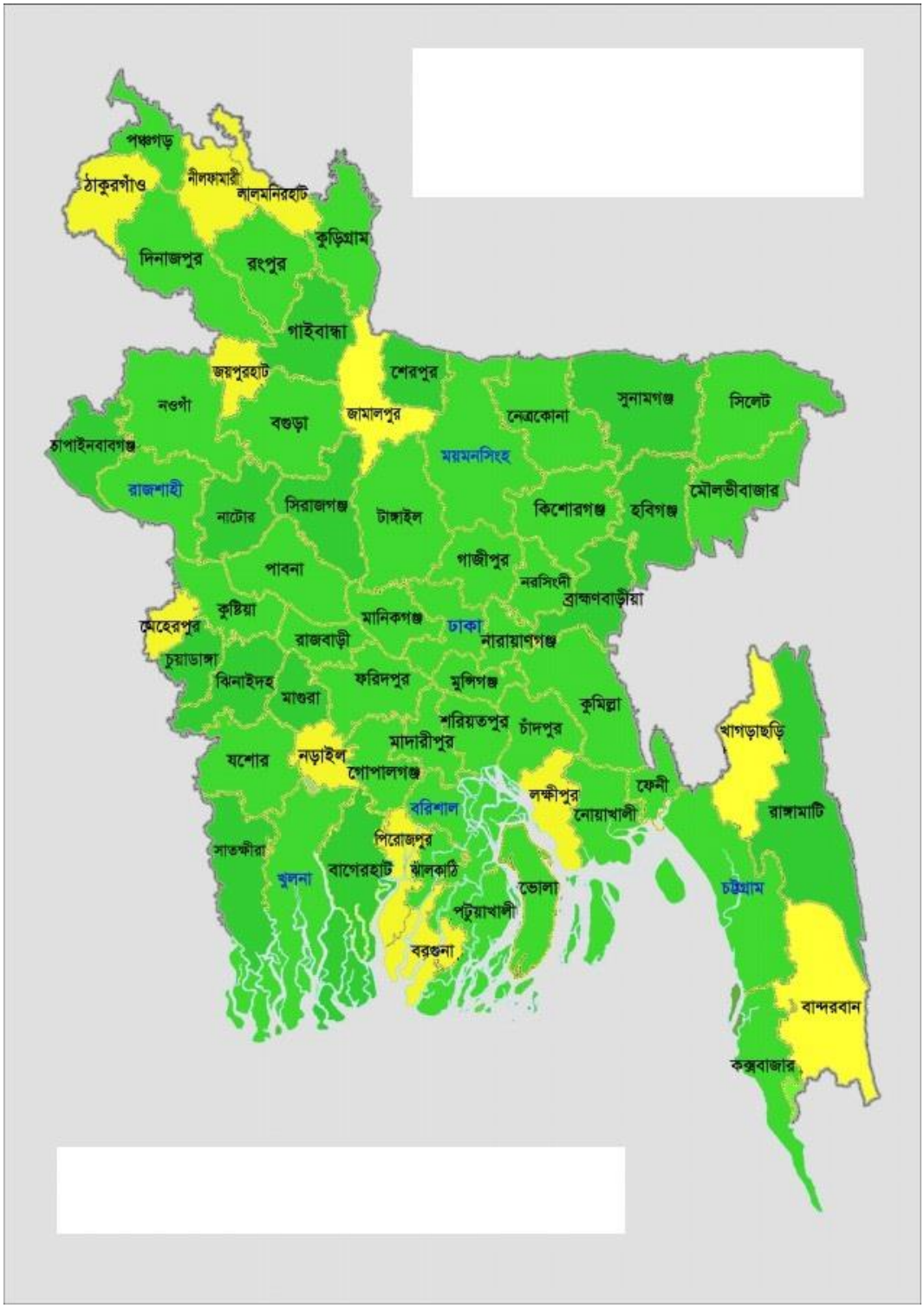

➢ ঢাকা বিভাগের মানচিত্রে নিজ জেলা

- নিজ জেলার মানচিত্র

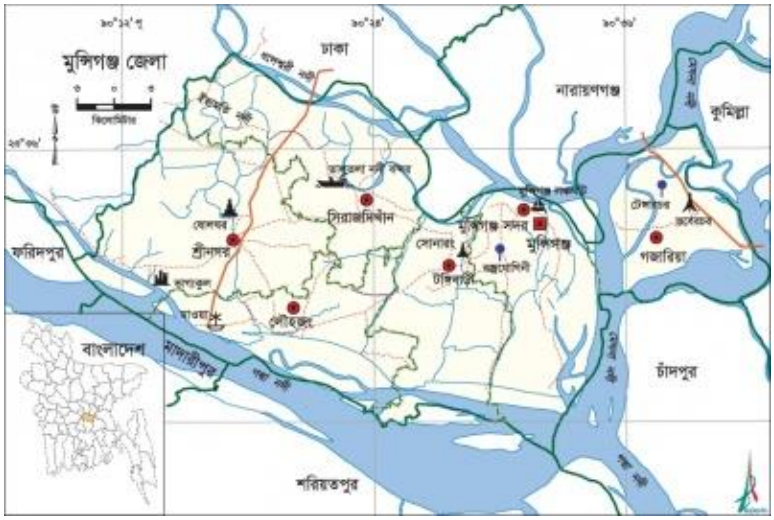

তথ্য সূত্রঃ বিবিএস